সত্যের সাক্ষ্য

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

সত্যের সাক্ষ্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সত্যের সাক্ষ্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

প্রকাশক
আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭

বর্তমান প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী - ২০১১
ফাল্গুন - ১৪১৭
রবিউল আউয়াল - ১৪৩২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৬.০০ (ষোল) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

"SHATTYER SHAKKHYA", by Sayyed Abul A'la Maududi. Translated by Muhammad Nurul Islam, Published by: **ATM Masum**, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaat-e-Islami, 504/1 Baro Moghbazar, Dhaka.
Fixed Price :Taka 16.00 (Sixteen) only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? সে দায়িত্ব পালনের মৌখিক ও বাস্তব পন্থা কি? বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) ১৯৪৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের শিয়াল-কোটের মুরাদপুর নামক স্থানে সাধারণ সম্মেলনের বক্তৃতায় এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সে ভাষণেরই একাংশ নিয়ে উর্দু ভাষায় 'শাহাদাতে হক' নামক পুস্তিকা রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা-ভাষি পাঠকদের নিকট সেটি 'সত্যের সাক্ষ্য' নামে প্রকাশ করা হলো। আলহামদুলিল্লাহ ইতোমধ্যে পুস্তিকা খানি পাঠকবর্গের চিন্তা-চেতনায় বিপুলভাবে দোলা দিতে সক্ষম হয়েছে। পাঠকবর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক। যিনি অসীম জ্ঞান, অনুগ্রহ ও ক্ষমতা বলে এই বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ন্যায় অমূল্য শক্তি আর সমাসীন করেছেন দুনিয়ায় তাঁর খিলাফতের মর্যাদায়। যিনি মানুষের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে নবীদের মারফত নাযিল করেছেন কিতাবসমূহ।

আল্লাহর করুণারাশি বর্ষিত হোক তাঁর সে সব সম্মানিত ও নেক বান্দাদের উপর যাঁরা দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শেখাতে, যাঁরা মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে গেছেন, আর বাতলে দিয়েছেন তার জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি। আজ দুনিয়ায় যা কিছু হিদায়াতের আলো, নৈতিক পবিত্রতা, পুণ্য ও পরহিযগারীর নিদর্শন দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে আল্লাহর এ নেক বান্দাদেরই পথ-নির্দেশের ফল। দুনিয়ার মানুষ কখনো তাঁদের এ অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা আমাদের সম্মেলনগুলোকে দু'টো অংশে ভাগ করে থাকি। একাংশে আমরা পরস্পর বসে আপন কাজ-কর্ম যাচাই-পর্যালোচনা করি এবং তাকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ করে থাকি। আর দ্বিতীয়াংশে আমরা সম্মেলন স্থানের সাধারণ অধিবাসীদের কাছে দাওয়াত পেশ করে থাকি। আজকের এ সম্মেলন শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা কোন্ বস্তুর দিকে লোকদের আহ্বান জানিয়ে থাকি অথবা আমাদের দাওয়াত কি, এ কথাটুকু বলার জন্যেই আমরা আপনাদেরকে এখন কষ্ট দিচ্ছি।

আমাদের দাওয়াত

আমাদের দাওয়াত হচ্ছে যারা প্রথমতঃ বংশগত মুসলমান এবং দ্বিতীয়তঃ মুসলমান নয় এমন সব মানবগোষ্ঠীর প্রতি। এদের প্রত্যেকের জন্যই

আমাদের কাছে বিশেষ পয়গাম রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখানে শেষোক্ত দলের লোকদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের অতীতের ভুল ও বর্তমান অবস্থার ফলেই মানব জাতির এক বিরাট অংশ আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। এমতবস্থায় তাদের ও আমাদের মহান প্রভু আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদের মারফত যে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, তাকে তাদের কাছে পৌছানোর সুযোগ আমরা খুব কমই পেয়ে থাকি। যা হোক, তারা এখানে উপস্থিত নেই বলে মুসলমানদের জন্যে দাওয়াতের নির্দিষ্ট অংশকেই আমি এখানে পেশ করবো।

মুসলমানদের প্রতি আমাদের আহ্বান হচ্ছে এই যে, মুসলমান হিসেবে তাঁদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত হয়, তা তারা পুরোপুরি অনুধাবন ও পালন করুন।

আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে মেনে নিয়েছি, কেবল এটুকু কথা বলেই আপনারা দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন না। বরং আপনাদের এ চেতনাও থাকতে হবে যে, যে মুহূর্তে আপনারা আল্লাহকে আপন প্রভু এবং তাঁর দীনকে নিজেদের জীবন-বিধান বলে মেনে নিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আপনাদের উপর এক বিরাট দায়িত্বও এসে পড়েছে। পরন্তু সে দায়িত্ব পালনের পন্থা কি, সে সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কারণ, এতে আপনারা ব্যর্থকাম হলে আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর মন্দ পরিণতি থেকে আপনারা কোথাও রেহাই পাবেন না।

মুসলমানের দায়িত্ব

সে দায়িত্বটা কি? তা শুধু আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও পরকালের প্রতি আপনাদের ঈমান আনা নয় অথবা তা শুধু আপনাদের নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া এবং হজ্জ করার ব্যাপারেও নয়, কিংবা তা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা ইসলামী বিধান মেনে নেয়াও নয়, বরং এ সবের উর্ধ্বে এক বিরাট দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়ে থাকে। তা হচ্ছে এই যে, যে মহান সত্যের উপর আপনারা ঈমান এনেছেন, তার সাক্ষীরূপে সারা দুনিয়ার সামনে আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে।

কুরআন মজীদে 'মুসলমান' নামে আপনাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনারা সমস্ত মানুষের সামনে পুরোপুরি সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হও আর রসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন।"
(সূরা আল বাকারাহ- ১৪৩)

জাতি হিসেবে এ হচ্ছে আপনাদের আবির্ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে না পারলে আপনাদের জীবন বৃথাই শেষ হয়েছে বলতে হবে। এ দায়িত্ব বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আপনাদের উপর অর্পিত হয়েছে।

আল্লাহর হুকুম হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ ـ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।"
(সূরা আন নিসা– ১৩৫)

এ নিছক নীতিকথা নয়, বরং এ হচ্ছে কড়া নির্দেশ। আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ

"যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন রাখে, তবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?
(সূরা বাকারা– ১৪০)

অতঃপর এ দায়িত্ব পালন না করার ভীষণ পরিণতির কথাও আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের পূর্বে ইহুদী জাতিকে এ সাক্ষীর

কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু তারা সত্যের কিছুটা গোপন আর কিছুটা তার বিপরীত সাক্ষ্যদান করেছিল। এমনিভাবে তারা সামগ্রিকভাবে সত্যের পরিবর্তে বাতিলের সাক্ষীতে পরিণত হয়ে গেল। ফলে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা এ দাঁড়ালো যে,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ـ

"লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো।"

(সূরা আল-বাকারা- ৬১)

সত্যের সাক্ষ্য

আপনাদের উপর এই যে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনাদের কাছে যে সত্য এসেছে, যে সত্য আপনাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, তার সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে এবং তার সরল-সোজা পথ হওয়া সম্বন্ধে আপনারা দুনিয়ার সামনে সাক্ষ্য দান করবেন। এমনি সাক্ষ্য দিবেন যেন সত্যতা যথার্থরূপেই প্রতিপন্ন হয় এবং দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর দীনের চূড়ান্ত প্রমাণও প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুত সত্যের এমনি সাক্ষ্য দানের জন্যেই যুগে যুগে নবীগণের আবির্ভাব হয়েছিল। আর এ দায়িত্ব পালন করা ছিল তাঁদের অপরিহার্য কর্তব্য। নবীদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব এসে পড়েছে সম্মিলিতভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উপর।

সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব

এ সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব আপনারা এথেকে অনুধাবন করতে পারেন যে, এর ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলা মানুষের হিসাব-নিকাশ এবং পুরস্কার বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী, মেহেরবান এবং ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অগাধ জ্ঞান, অসীম অনুগ্রহ ও ন্যায় বিচারের কাছে থেকে এটা আশা করা যেতে পারে না যে, মানুষ তার ধর্মীয় কথা জানতে পারবে না অথচ তার বিপরীত পথে চলার অপরাধে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। মানুষ সরল-সোজা পথের কথা জানবে না অথচ সে পথে না চলার দরুন তাকে ধরে তিনি শাস্তি দেবেন। বস্তুত কোন্ বস্তুটি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, তা মানুষের অজ্ঞাত থাকবে আর তার কাছ থেকে সে সম্পর্কেই জবাব চাওয়া হবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষকেই একজন নবীরূপে সৃষ্টি করেন। অতঃপর মানুষকে তাঁর মরযী ও দুনিয়ার জীবন যাপনের নির্ভুল পদ্ধতি শেখানোর জন্যে যুগে যুগে আরো অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, দেখো, এ পথে তোমরা প্রকৃত মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। আর এগুলো হচ্ছে বর্জনীয় এবং এসব জিনিস সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে, ইত্যাদি।

চূড়ান্ত প্রচেষ্টা

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের দ্বারা এসব সাক্ষ্যই দান করান। পবিত্র কুরআনে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং পরিণতির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তাঁর কাছে এরূপ বিতর্ক তোলার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো বে-খবর ছিলাম। আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৬৫)

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ককরণের দায়িত্ব নবীগণের উপর অর্পণ করেন এবং তাঁরা এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কাজে নিয়োজিত হন। আর তাঁরা যথার্থরূপে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করলে লোকেরা নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে নিজেরাই দায়ী হতে পারে। আর যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়, তবে সাধারণ মানুষের গোমরাহীর জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, নবীদের উপর অতি বিরাট ও সংকটপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। আর তা ছিল এই যে, হয় তাঁদেরকে যথার্থরূপে সত্যের সাক্ষ্য দান করে মানুষের কাছে সত্যকে চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করতে হতো অথবা তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের এ অভিযোগের সম্মুখীন হতে হতো যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন আপনারা তা আমাদের কাছে সরবরাহ করেননি। জীবন যাপনের যে সঠিক পদ্ধতি তিনি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদেরকে তা শিখিয়ে দেননি। এ কারণেই নবীগণ এ দায়িত্বের গুরুত্ব তীব্রভাবে অনুভব করতেন। আর এ কারণেই তাঁরা সত্যের সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালনে এবং মানুষের কাছে সত্যকে চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন।

জবাবদিহি

অতঃপর নবীদের মাধ্যমে যারা জ্ঞান ও হিদায়াতের পথ পেয়েছেন, তারাই একটি উম্মত বা জাতিতে পরিণত হয়েছে। নবীদের উপর সত্যের সাক্ষ্যদানের যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তাঁদের অবর্তমানে তা উম্মতের উপর এসে পড়লো। তারাই এখন নবীদের উত্তরাধিকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। এখন যদি তারা সত্যের সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সত্যপন্থী না হয়, তবুও তারা পুরস্কৃত হবে এবং সাধারণ মানুষ আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তারা যদি সত্যের সাক্ষ্যদানের কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করে অথবা সত্যের পরিবর্তে অসত্যের বা বাতিলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, তবে লোকদের আগে তারাই ধরা পড়বে। তারা নিজেদের কার্যাবলী সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসিত হবেই তদুপরি সাক্ষ্যদানে তাদের অবহেলার অথবা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করার দরুন যারা গোমরাহী, বিপর্যয় ও ভ্রান্তির পথে চলেছে, তাদের কার্যাবলী সম্পর্কেও তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি

ভদ্র মহোদয়গণ! সত্যের সাক্ষ্যদানের এ সংকটজনক দায়িত্বই আমার, আপনার ও যারা মুসলিম জাতি বলে পরিচয় দেয় এবং যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও নবীদের হিদায়াত বর্তমান রয়েছে, তাদের উপরও ন্যস্ত হয়ে আছে। এখন এ সাক্ষ্য দানের পন্থা কি তা ভেবে দেখুন। সাক্ষ্য দু'রকমের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য, আর একটি বাস্তব সাক্ষ্য।

মৌখিক সাক্ষ্যদান

মৌখিক সাক্ষ্য বলতে বুঝায় নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসে পৌঁছেছে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তাকে তুলে ধরা। মানুষকে বুঝাবার ও তাদের মর্মে প্রবেশ করানোর সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার সম্ভাব্য সকল

উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সমস্ত মাল-মসলাকে আয়ত্তে এনে আল্লাহর মনোনীত দীনের সাথে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া। পরন্তু মানুষের চিন্তায়, বিশ্বাসে, নৈতিকতায়, তাহযীব-তামাদ্দুনে, সামাজিক রীতি-নীতিতে, রুজি-রোজগারে, লেনদেন ও আইন-আদালতে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং মানবীয় বিষয়াদি অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগের জন্যে এ পেশকৃত শিক্ষাকে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিবৃত করা, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তার সত্যতার প্রমাণ করা এবং এর বিপরীত যত মতাদর্শ বর্তমান রয়েছে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার মাধ্যমে তার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা। কিন্তু যে পর্যন্ত না গোটা মুসলিম জাতি মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য নবীদের ন্যায় চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পর্যন্ত এ মৌখিক সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় হতে পারে না। কর্তব্য পালন করতে হলে এ কাজটিকে আমাদের সামগ্রিক চেষ্টা, সাধনা ও জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে এবং সকল কাজেই এ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। পরন্তু আমাদের মধ্য থেকে সত্যের বিপরীত সাক্ষ্য দানকারী কোন আওয়াজকেই বরদাশত না করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাস্তব সাক্ষ্যদান

বাস্তব সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা যেসব নিয়ম-নীতিকে সত্য বলে প্রচার করি আমাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ যেন আমাদের কাছ থেকে ঐ নীতিগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে কেবল মৌখিক চর্চাই শুনতে না পায়, বরং তারা যেন স্বচক্ষে আমাদের জীবনে ঐ সবের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। ঈমানের কল্যাণে মানুষ নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তার রসাস্বাদন করতে পারে। এ দীনের পথ-নির্দেশে কেমন আদর্শ মানুষ তৈরি হয়, কিরূপ ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হয়, কেমন সৎ সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়, কত স্বচ্ছ ও পবিত্র তামাদ্দুন গড়ে ওঠে, কিরূপ সঠিক ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, কি রকম সুবিচার ও সহানুভূতিপূর্ণ এবং আর্থিক সহযোগিতার সূচনা হয় আর ব্যক্তি ও সমাজ

জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ কেমন পরিশুদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও কল্যাণের সম্পদে ভরপুর হয়ে ওঠে, তা যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে পারে। বস্তুত আমরা যদি ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে নিজেরা দীনের মূর্তিমান সাক্ষ্যে পরিণত হতে পারি, আমাদের ব্যক্তি চরিত্র সত্যতার প্রমাণ পেশ করে, আমাদের ঘর-বাড়ী সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, আমাদের দোকানপাট ও কল-কারখানাগুলো তার রৌশনীতে ঝলমল করে ওঠে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তারই আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে; আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তারই সৌন্দর্য চর্চায় নিয়োজিত হয় এবং আমাদের জাতীয় নীতি ও সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনা তার সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এ সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথার্থরূপে পালিত হতে পারে।

মোদ্দা-কথা, যে-কোন স্থানে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন ব্যক্তি বা জাতির সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক না কেন, আমরা যে নীতিগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি এবং যার বদৌলতে মানুষের জীবন বাস্তবিকই সুন্দর ও উন্নত হতে পারে, তারা যেন আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রে সে সব নীতির সত্যতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে পারে।

সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা

প্রসংগত এ কথাও বলে রাখতে চাই যে, এসব মূলনীতির ভিত্তিতে যখন আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা আল্লাহর দীনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার বিচার, ইনসাফ, সংস্কারমূলক কার্যসূচি ও সুশৃংখল ব্যবস্থাদি, শান্তি-প্রিয়তা ও জনগণের কল্যাণ সাধন, শাসক শ্রেণীর সচ্চরিত্র, সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ইনসাফ ভিত্তিক পররাষ্ট্র নীতি, ভদ্রতাপূর্ণ যুদ্ধ এবং আনুগত্যমূলক সন্ধির মাধ্যমে এ কথারই সাক্ষ্য দেবে যে, যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা এ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তা সত্যিই মানব কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম এবং এরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, কেবল তখনই এ সাক্ষ্যদান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। আর এমনি সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্যের সাথে মিলিত হলেই মুসলিম জাতি পুরোপুরি এর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে, আর তখনই মানব জাতির সামনে সত্য চূড়ান্তরূপে

প্রকাশ পেতে পারে আর আখিরাতের আদালতে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর পর আমাদের জাতি এ সাক্ষ্য দেয়ার অধিকারী হতে পারবে যে, হযরত (স.) আমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়েছিলেন আমরা তা দুনিয়ার মানুষের কাছে যথার্থরূপেই পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যারা সত্য পথে আসেনি, তারা নিজেরাই তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী।

ভদ্র মহোদয়গণ, মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এমনি সাক্ষ্যদান করাই ছিল কর্তব্য। কিন্তু আজ ভেবে দেখুন, বাস্তবে আমরা কেমন সাক্ষ্য দান করে চলেছি।

মৌখিক সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

মৌখিক সাক্ষ্যের কথাই প্রথমে ধরা যাক। আজ ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের জন্য সাক্ষ্যদানের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে এমন খুব কম লোকই আমাদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তাদের মধ্যেও আবার যথার্থরূপে এ কাজ করে যাচ্ছেন এমন লোকও খুব নগণ্য। যা হোক, এ নগণ্য সংখ্যক লোককে যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, মুসলিম জাতির সাধারণ সাক্ষ্য ইসলামের অনুকূলে নয়, বরং তার প্রতিকূলেই চলে যাচ্ছে। আমাদের ভূ-স্বামীগণ ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তে জাহিলী রীতিকে যথার্থ বলে সাক্ষ্য দান করছেন। আমাদের উকিল, মোক্তার ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইসলামের যাবতীয় আইন-কানুনকে শুধু ভুল নয়, বরং ইসলামের মৌলিক আইন শাস্ত্রকে গ্রহণের অযোগ্য এবং মানব রচিত আইনকে নির্ভুল বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আমাদের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং আইন শাস্ত্র ও নৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য মতবাদকে সত্য এবং ইসলামী মতবাদকে ভ্রুক্ষেপ করার ও অনুপযোগী বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

অনুরূপভাবে আমাদের সাহিত্যিকগণ সাক্ষ্য দান করছেন যে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ধর্মবিমুখ নাস্তিক সাহিত্যিকদের যা আদর্শ

তাদের আদর্শও তাই এবং মুসলিম সাহিত্যিক হিসেবে তাদের সাহিত্যের কোন স্বতন্ত্র মর্মবাণী নেই।

আমাদের পত্র-পত্রিকা ও প্রচার যন্ত্রগুলো এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, অমুসলিমদের কাছে যে সব নীতি এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি রয়েছে তাদেরও নীতি এবং প্রচার পদ্ধতি ঠিক তাই। এখানকার ব্যবসায়ী ও মালিকগণ সাক্ষ্য দান করছে যে, লেন-দেন সম্পর্কীয় ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শুধু অমুসলিমদের অনুসৃত পন্থায়ই কাজ-কারবার চলতে পারে। আমাদের নেতৃবৃন্দ সাক্ষ্যদান করে চলেছেন যে, অমুসলিমদের কাছে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার যে যিকির, জাতীয় দাবী-দাওয়া, জাতীয় সমস্যাবলী সমাধান করার যে পন্থা এবং রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের যে মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কাছেও ঠিক তাই রয়েছে। এসব ব্যাপারে যেন ইসলাম তাদেরকে কোন পথের সন্ধান দেয়নি। আমাদের জনগণ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মুখে দুনিয়াবী কাজ-কারবারের চর্চা ব্যতীত অন্য কোন আলোচ্য বিষয় নেই। তারা এমন কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় যার আলোচনায় কিছু সময় ব্যয় করতে পারে। আজ শুধু ভারতের (উপমহাদেশে) নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমান যে মৌখিক সাক্ষ্য দান করছে, এ হচ্ছে তার নমুনা।

বাস্তব সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

এবার বাস্তব সাক্ষ্যের কিছু নমুনা দেখুন। মৌখিক সাক্ষ্যের তুলনায় এ অবস্থা আরো শোচনীয়। অবশ্য কোন কোন স্থানে এমন কিছু সৎ ব্যক্তিও রয়েছেন, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামকে প্রতিফলিত করে চলেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা কি? ব্যক্তিগত জীবনে মুসলিম জনসাধারণ ইসলামের যে প্রতিনিধিত্ব করছে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত ব্যক্তিগণ কোন দিক দিয়েই কুফরী পরিবেশে লালিত-পালিত লোকদের তুলনায় উন্নত অথবা স্বতন্ত্র নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা মিথ্যা বলতে পারে, খিয়ানত করতে পারে, অত্যাচার চালাতে পারে, ধোকা দিতে পারে, ওয়াদা খেলাফ করতে পারে, চুরি-ডাকাতি করতে

পারে, দাংগা-ফাসাদ করতে পারে, তারা নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার যাবতীয় কাজই করতে পারে। নৈতিকতা বিরোধী এসব আচরণে তারা গড়পড়তা হিসেবে কোন কাফির জাতির তুলনায় কম নয়। পরন্তু আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি, চাল-চলন, উঠা-বসা, রসম-রেওয়াজ, উৎসব-আনন্দ, মেলা-উরস, সভা, শোভাযাত্রা, মোদ্দা কথা সমাজ জীবনে কোন একটি দিক ও বিভাগেও আমরা ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করছি না। আমাদের এসব আচরণ এ কথারই বাস্তব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামপন্থীগণ নিজেদের জন্যে ইসলামের পরিবর্তে জাহিলিয়াতকেই বেশী অনুকরণযোগ্য মনে করছে।

আমরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাতে শিক্ষা, শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষার দর্শন সব কিছুই অমুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকি। কোন সমিতি কায়েম করলে তার উদ্দেশ্য, গঠন-পদ্ধতি কর্মনীতি সব কিছুই অমুসলিমদের সমিতি থেকে নিয়ে থাকি। আমাদের জাতি কোন সামগ্রিক চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে তার দাবী-দাওয়া, তার তদবীরের পন্থা, দলের গঠনতন্ত্র, নিয়ম-পদ্ধতি, তার প্রস্তাবাবলী, বক্তৃতা-বিবৃতি সব কিছুই অবিকল অমুসলিম জাতির অনুরূপ হয়ে থাকে। এমন কি যেখানে আমাদের স্বাধীন অথবা আধা-স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সরকার বর্তমান রয়েছে, সেখানেও আমরা রাষ্ট্রের ভিত্তি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং যাবতীয় আইন-কানুন অমুসলিমদের কাছ থেকেই ধার করে নিয়েছি। কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন শুধু পার্সনাল-ল' হিসেবেই রয়ে গেছে। আর কোন কোন রাষ্ট্রে তো তাকেও পরিবর্তন না করে ছাড়েনি। অধুনা লরেন্স ব্রাউন (Lawrence Brown) নামক জনৈক ইংরেজ লেখক 'দি প্রসপেক্টস অব ইসলাম' (The prospects of Islam) নামক গ্রন্থে বিদ্রূপ করে বলেছেন ঃ

> "আমরা যখন ভারতে ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে সেকেলে ও অকেজো মনে করে রহিত করে দিয়ে কেবল মুসলমানদের পার্সোনাল- ল' হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম, তখন মুসলমানদের কাছে তা বড় অপছন্দনীয় বলে মনে হচ্ছিল। কারণ এর ফলে তাদের অবস্থা এককালীন ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম যিম্মীদের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমাদের নীতি শুধু

ভারতীয় মুসলমানদেরই মনঃপূত হয়নি, বরং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও আজ আমাদের অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করছে। তুরস্ক ও আলবেনিয়া তো বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন পর্যন্ত আমাদের মানদণ্ড অনুযায়ী সংশোধন করে নিয়েছে। এথেকে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'আইনের উৎস হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা মাত্র'- মুসলমানদের এ ধারণাটি নিছক একটি পবিত্র কাহিনী (Pious Fiction) ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

আজ সারা দুনিয়ার মুসলমান সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যে বাস্তব সাক্ষ্য দান করে চলছে, এ তো হচ্ছে তার নমুনা। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, আমাদের সামগ্রিক কার্যকলাপ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এ দীন ইসলামের কোন নিয়ম-নীতিই আমাদের মনঃপূত নয় এবং এর প্রবর্তিত কানুনের মধ্যেও আমাদের কোন কল্যাণ ও মুক্তি নেই।

সত্য গোপনের শাস্তি

এমনি সত্য গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মধ্যেই আজ আমরা লিপ্ত হয়ে আছি। আর আল্লাহ্ তাআলা এমনি গুরুতর অপরাধের জন্যে যে ভীষণ পরিণাম নির্ধারিত করে রেখেছেন, আমাদেরকে ঠিক সেই পরিণতিরই সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

যখন কোন জাতি আল্লাহর কোন নিয়ামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে আপন সৃষ্টিকর্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আল্লাহ্ তাকে ইহকাল ও পরকালে সর্বত্রই শাস্তি দিয়ে থাকেন। ইহুদী জাতির বেলায় আল্লাহ্ তাআলার এই শাশ্বত বিধান পুরোপুরি কার্যকরী হয়েছে। আর আজ আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। ইহুদীদের সংগে আল্লাহ্ তাআলার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না, যে তিনি শুধু তাদেরকেই অপরাধের শাস্তি দান করবেন। আর আমাদের সংগে তাঁর এমন কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, অপরাধে লিপ্ত থেকেও আমরা তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো। বস্তুত আমরা সত্যের সাক্ষ্যদানে যতটুকু ত্রুটি করে আসছি আর বাতিলের সাক্ষ্যদানে যতখানি

তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছি, ঠিক ততটাই আমরা অধঃপাতের দিকে নেমে যাচ্ছি।

গত এক শতাব্দীর মাঝেই মরক্কো থেকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংগাপুর ইত্যাদি) পর্যন্ত একের পর এক দেশ আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। মুসলিম জাতিগুলো একে একে পরাজিত ও পরাধীন হয়ে পড়েছে। মুসলিম নাম আর গৌরব ও সম্মানের প্রতীকরূপে নয়-অপমান, দারিদ্র্য ও অবনতির প্রতীক স্বরূপ রয়ে গেল। দুনিয়ায় মান-সম্মান বলতে আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কোথাও আমাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হলো, আর কোথাও আমাদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হলো, আর কোথাও শুধু চাকরি-বাকরি ও খেদমতের কাজে ব্যবহার করার জন্যে জীবিত রাখা হলো। যেখানে মুসলমানদের নিজস্ব সরকার ছিল, সেখানেও তারা ক্রমাগতভাবে পরাজিত হতে লাগলো। আজ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বিদেশী শক্তির ভয়ে তারা সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, অথচ তারা যদি ইসলামের মৌখিক এবং বাস্তব সাক্ষ্য দান করতো, তাহলে কুফরের ধারক ও বাহকরাই তাদের ভয়ে কম্পমান থাকতো।

এ কথাটা বুঝতে খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। এই উপমহাদেশে নিজেদের অবস্থাটাই একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখুন। আপনারা সত্যের সাক্ষ্যদানে যে ক্রটি করেছেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের বিপরীত যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারই ফলে একের পর এক রাজ্য আপনাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেল। প্রথমে আপনারা মারাঠা ও শিখদের হাতে নাজেহাল হলেন। তারপর ইংরেজদের গোলামী আপনাদের ভাগ্যে জুটলো। আর এখন পূর্বের পরাজয়ের চেয়ে অধিকতর শোচনীয় পরাজয় আপনাদের সামনে আসছে। আজ আপনাদের সামনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আপনারা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীন হয়ে পড়ায় এবং এককালীন নমশূদ্র জাতির মতো পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার আতংকে সদা কম্পমান রয়েছেন। কিন্তু আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় বলুন তো, আপনারা যদি ইসলামের যথার্থ সাক্ষী হতেন, তাহলে কি এখানকার কোন

সংখ্যাগুরু জাতি আপনাদের ভয়ের কারণ হতে পারতো? আর আজো যদি আপনারা কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের যথার্থ সাক্ষ্যদানকারী হন, তাহলে কি কয়েক বছরের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রশ্নে মীমাংসা হয়ে যায় না? আরবের মাত্র প্রতি লাখে একজন সংখ্যালঘুকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সিদ্ধান্ত করেছিল এক বিদ্বেষ পরায়ণ ও চরম অত্যাচারী সংখ্যাগুরু জাতি। কিন্তু ইসলামের সত্যতার সাক্ষীগণ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যালঘুদেরকে শতকরা একশত জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপান্তরিত করেছিল। অতঃপর ইসলামের সাক্ষ্য দানকারী এই জাতিটি যখন আরব থেকে বের হলো, তখন মাত্র ২৫ বছরের মধ্যেই তুর্কীস্তান থেকে মরক্কো পর্যন্ত একের পর এক জাতি তাঁদের সাক্ষ্যদানের উপর ঈমান আনতে লাগলো। যেসব এলাকায় শতকরা একশতজন অগ্নিপূজক ও খ্রিষ্টান বাস করতো, সেখানে শতকরা একশতজনই মুসলমান বাস করতে লাগলো। কোন প্রকার হঠকারিতা, জাতি-বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতাই সত্যের এই বাস্তব ও জীবন্ত সাক্ষ্যের সামনে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ানোর মতো মযবুত বলে প্রমাণিত হয়নি। কাজেই আজ যদি আপনারা অন্য জাতির পদানত হয়ে গিয়ে থাকেন এবং অধিকতর শোচনীয়রূপে পদানত হওয়ার আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন, তাহলে তা সত্য গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অনিবার্য শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

পরকালের শাস্তি

এইতো হচ্ছে এ অপরাধের জন্য দুনিয়ার জীবনে প্রাপ্য শাস্তির নমুনা। আর পরকালে এর চেয়েও কঠিনতর শাস্তির আশংকা রয়েছে। যতক্ষণ আপনারা সত্যের সাক্ষীরূপে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় যত গোমরাহী বিস্তার লাভ করবে, যত যুলুম-পীড়ন, ফিতনা-ফাসাদ, নাফরমানীমূলক ব্যাপার ঘটবে, যত অনৈতিকতা ও অসচ্চরিত্রতার প্রচলন হবে, নিজ দায়িত্ব থেকে আপনারা কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন না। কারণ ঐ সকল অনাচার সৃষ্টির দায়িত্ব যদিও আপনাদের নয়, কিন্তু ঐগুলো সৃষ্টি হওয়ার কারণ জিইয়ে রাখার এবং এগুলোর বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই দায়ী।

মুসলমানদের সমস্যা ও তার সমাধান

ভদ্র মহোদয়গণ! এ পর্যন্ত আমি যা কিছু আরয করলাম, তা থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, মুসলমান হিসেবে আমাদের কি কর্তব্য ছিল আর কি করছি এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আমাদের কি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এদিক থেকে যদি আপনারা প্রকৃত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে স্বভাবতই আপনাদের কাছে এ সত্যটি উদঘাটিত হবে যে, মুসলমানরা আজ ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেসব সমস্যাকে তাদের জাতীয় জীবনের আসল সমস্যা বলে মনে করে নিয়েছে এবং যেগুলোর সমাধানের জন্য কিছুটা পরিকল্পিত আর বেশির ভাগই অন্যের কাছ থেকে ধার করে আনা পন্থায় সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর কোনটিই তাদের সমস্যা নয়। আর সেগুলোর সমাধানের জন্যে সময়, শক্তি, শ্রম ও অর্থ ব্যয় নিছক পণ্ডশ্রম বৈ কিছুই নয়।

একটি সংখ্যালঘু জাতি আর একটি সংখ্যাগুরু জাতির মাঝখান থেকে নিজেদের স্বার্থ, অস্তিত্ব ও অধিকার কি করে রক্ষা করবে, কোন সংখ্যালঘু জাতি নিজ নিজ সীমার ভেতরে সংখ্যাগুরুর ন্যায় অধিকার কেমন করে আদায় করবে, কোন পরাধীন জাতি একটি পরাক্রমশালী জাতির অধীনতা থেকে কেমন করে মুক্ত হবে, একটি দুর্বল জাতি একটি শক্তিশালী জাতির অন্যায় ও যুলুম থেকে কেমন করে আত্মরক্ষা করবে, একটি অনুন্নত জাতি কেমন করে একটি শক্তিশালী জাতির ন্যায় উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শক্তি অর্জন করবে, এ ধরনের সমস্যা অমুসলিমদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম সমস্যা বিবেচিত হতে পারে এবং এগুলোর প্রতিই তাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও মনোযোগ কেন্দ্রীভুত হতে পারে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের পক্ষে এগুলো কোন স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সমস্যাই নয়, বরং এ হচ্ছে আমাদের আসল কাজের প্রতি বিমুখতারই অনিবার্য পরিণতি। আমরা যদি সে কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতাম, তাহলে আজ আর এত জটিল ও উদ্বেগজনক সমস্যার স্তূপ জমতে পারত না। এখনো যদি আমরা ঐ আবর্জনা পরিষ্কার করার পরিবর্তে আমাদের যাবতীয় মনোযোগ ও শক্তি–সামর্থকে সেই আসল

কর্তব্য পালনে নিয়োজিত করি, তাহলে অনতিকালের মধ্যেই শুধু আমাদের নয়, সারা দুনিয়ার পক্ষে উদ্বেগজনক সমস্যার আবর্জনা স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ, দুনিয়াকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ রাখার দায়িত্ব আমাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব পালনে গাফলতির ফলেই আজ দুনিয়াটা সমস্যার আবর্জনায় ভরে গেছে। আর দুনিয়ার সর্বাধিক জঞ্জালময় অবস্থাটা আমাদের ভাগেই পড়েছে।

পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টি বুঝবার জন্যে আদৌ চেষ্টা করছেন না। মুসলিম জনসাধারণকে আজ সর্বত্রই এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন, স্বদেশের স্বাধীনতা, জাতীয় স্বার্থরক্ষা, বৈষয়িক উন্নতি ইত্যাদিই হচ্ছে তোমাদের আসল সমস্যা। পরন্তু এই ভদ্রলোকেরা এসব সমস্যার সমাধানের যে পন্থা অমুসলিমদের কাছ থেকে শিখেছেন, তাই তারা মুসলমানদের কাছে পেশ করছেন। কিন্তু আমি আল্লাহর অস্তিত্বের উপর যতটা বিশ্বাসী ঠিক ততখানি দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি যে, এদ্বারা আপনাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। আর এ পথে চলে আপনারা কখনো কল্যাণময় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না।

আসল সমস্যা

তাই আপনাদের জীবনে প্রকৃত সমস্যা কি, এ কথা অকপটে ও পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত না করলে আপনাদের চরম অহিতাকাঙ্ক্ষী বলেই প্রমাণিত হবে। আমার জানা মতে আপনাদের বর্তমান, ভবিষ্যত একটি বিশেষ প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে যে হিদায়াত পাঠিয়েছেন, যার কল্যাণে আপনারা মুসলিম নামে অভিহিত হচ্ছেন এবং যার সাথে সম্পর্ক থাকার দরুন ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় আপনারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রতিনিধি সাব্যস্ত হয়েছেন, তার সংগে আপনারা কিরূপ আচরণ করছেন? আপনারা যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের আনুগত্য করেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেন আর আপনাদের জাতীয় চরিত্রে ইসলামকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করেন, তাহলে আপনারা দুনিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালে সাফল্য ও

কল্যাণের অধিকারী হবেন। আপনাদের উপর ভয়-ভীতি, অপমান–লাঞ্ছনা এবং পরাজয় ও পরাধীনতার যে মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি আপনাদের আহ্বান ও সচ্চারিত্রিক মাধুর্য লোকদের মস্তিষ্ক প্রভাবিত করবে। দুনিয়াজোড়া আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম হবে। আপনাদের কাছ থেকেই ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করা হবে। আপনাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার উপরই লোকেরা ভরসা করবে। আপনাদের মুখনিঃসৃত বাণীই সকল মহলে প্রবল বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। আপনারাই হবেন যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কুফরী নেতৃত্বের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আপনাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে তাদের সমুদয় দর্শন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। তাদের শিবিরে আজ যেসব শক্তির সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, তা ছিন্ন হয়ে ইসলামের শিবিরে এসে পড়বে।

এভাবে এমন এক দিন আসবে যখন কম্যুনিজম মস্কোতে থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। পুঁজিবাদপুষ্ট গণতন্ত্র ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে থেকেই আত্মরক্ষার চিন্তায় কম্পমান হবে। লন্ডন ও প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জড়বাদপুষ্ট ও নাস্তিক্যবাদের জায়গা খুঁজ পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। বংশপূজা ও জাতীয়তাবাদ স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও জার্মানদের মাঝেও ভক্ত খুঁজে পাবে না। আর বর্তমান যুগটি এমন একটি শিক্ষামূলক কাহিনীরূপে ইতিহাসে স্থান পাবে যে, ইসলামের ন্যায় বিশ্বগ্রাসী শক্তির ধারকগণও কোনকালে এমনি বেকুব বনে গিয়েছিল যে, হযরত মুসা (আ.) এর যষ্টি (عصائے موسی) বগল তলে চেপে রেখেও লাঠি ও রশি দেখে সাপের ভয়ে কাঁপছিল।

বস্তুত ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ও সত্যিকারের সাক্ষ্যদানকারী হলেই আমাদের ভবিষ্যত এমনি উজ্জ্বল হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত আপনারা যদি আল্লাহর প্রেরিত হিদায়াতের উপর জেঁকে বসে থাকেন তা থেকে না আপনারা নিজেরা উপকৃত হন, আর না অন্যকে উপকৃত হতে দেন। আপনারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে ইসলামের প্রতিনিধি সেজে

বসেন আর নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে শিরক, জাহিলিয়াত, দুনিয়াপূজা এবং নৈতিক উচ্ছৃংখলতার পথেই বেশীর ভাগ সাক্ষ্য দান করেন। আল্লাহর কিতাব তাকের উপর রেখে পথ নির্দেশের জন্য ধাবিত হন কুফরের ধ্বজাধারী ও গোমরাহীর উৎসের দিকে। আল্লাহর বন্দেগীর দাবী করে প্রকৃত শয়তানী ও আল্লাদ্রোহী শক্তিগুলোরই দাসত্ব করেন, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা শুধু প্রবৃত্তির লালসার জন্যেই করেন, আর উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখেন আর এভাবে নিজেদের জীবনকেও ইসলামের কল্যাণ থেকে দূরে রাখেন এবং দুনিয়াবাসীকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিবর্তে উল্টো আরো দূরে ঠেলে দেন, তবে এমতবস্থায় আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাত কোনটাই কল্যাণময় হতে পারে না। বরং আজ আপনারা যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুসারে এরূপ কর্মনীতির পরিণতি। আর অদূর ভবিষ্যতে এর চেয়েও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

ইসলামের লেবেলটা খুলে দিয়ে প্রকাশ্যে কুফরকে গ্রহণ করলে হয় তো পারসীয়ান, আমেরিকান ও বৃটেনের মতো আপনাদের দুনিয়াবী যিন্দেগীটা চাকচিক্যময় হতে পারতো কিন্তু মুসলমান হয়ে অমুসলমানদের মতো জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর দীনের ভূয়া প্রতিনিধিত্ব করে দুনিয়ার মানুষের জন্যে হিদায়াতের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার এই গুরুতর অপরাধ আপনাদের দুনিয়াবী যিন্দেগীকেও সমৃদ্ধিশালী হতে দেবে না। এ অপরাধের যে শাস্তির কথা কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যার জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে আপনাদের সামনে ইহুদী জাতি বর্তমান রয়েছে, তা কিছুতেই নড়চড় হতে পারে না। আপনারা একজাতিত্বের লঘুতর বিপদকে اَهْوَنُ الْبَلِيَّتَيْنِ গ্রহণ করুন কিংবা মুসলিম জাতীয়তার নামে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার স্বীকৃতি আদায় করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেন, এ থেকে কোন মতেই আপনারা রেহাই পেতে পারেন না। কারণ এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র পথই হচ্ছে ঐ অপরাধ থেকে বিরত থাকা।

আমাদের উদ্দেশ্য

এখন আমরা কি উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছি তাই আমি আপনাদের কাছে সংক্ষেপে ব্যক্ত করবো। যারা ইসলামকে নিজেদের দীন বলে স্বীকার করে থাকেন, তাদেরকে আমরা এই আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন এই দীনকে নিজেদের প্রকৃত জীবন বিধানে পরিণত করেন। একে যেন ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের জীবনে ও সামগ্রিকভাবে নিজেদের গৃহে, খান্দানে, সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, অর্থনৈতিক কাজ কারবারে, সমিতি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং সাধারণভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তার যথার্থ সাক্ষ্য দান করেন। আমরা তাদেরকে আরো বলছি যে, মুসলমান হিসেবে দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্যদানই আপনাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আপনাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও ক্রিয়া-কলাপ এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হওয়া উচিত। যেসব কথা ও কাজে ইসলামের বিরোধিতা এবং ভুল প্রতিনিধিত্ব হওয়ার আশংকা রয়েছে, তা থেকে আপনাদের সর্বতোভাবে বিরত থাকা কর্তব্য। আপনাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে ইসলামের মানদণ্ডে যাচাই করুন। দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, যথার্থরূপে তার সত্যতার সাক্ষ্য দান করা এবং চূড়ান্তরূপে সত্যকে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতি দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্যে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করুন।

আমাদের কর্মপদ্ধতি

জামায়াতে ইসলামী কায়েম করার এই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে পথ আমরা বাছাই করে নিয়েছি, তা হচ্ছে এই যে, আমরা প্রথমত মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেই। ইসলাম জিনিসটা কি, তার দাবী ও চাহিদা কি, মুসলমান হওয়ার তাৎপর্য কি, মুসলমান হওয়ার দরুন তাদের উপর কোন্ কোন্ দায়িত্ব অর্পিত হয়, এসব কথা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেই।

এ বিষয়টি যারা বুঝে নেন, তাদেরকে আমরা বলে দেই যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের সকল দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্যে সামগ্রিক ও সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনের সাথে দীনের এক ক্ষুদ্রতম অংশেরই সম্পর্ক রয়েছে মাত্র। সেটুকু আপনারা কায়েম করে ফেললেও পূর্ণ দীন কায়েম হয়ে যাবে না এবং এতে তার সত্যতার সাক্ষ্যও আদায় হবে না। বরং সমাজ জীবনের কুফরী ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকলে ব্যক্তির জীবনেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামকে কায়েম করা সম্ভব হবে না। কুফরী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব দিন দিন ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে সীমিত ও সংকুচিত করতে থাকবে। তাই দীনকে পূর্ণরূপে কায়েম করার এবং যথার্থরূপে তার সত্যতার সাক্ষ্য দান করার জন্যে সকল দায়িত্বসম্পন্ন মুসলমানের সংঘবদ্ধভাবে দীন-ইসলামকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত ও তার দিকে দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানো এবং সেই সংগে দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচারের পথ থেকে সকল বাধা বিপত্তিকে হটিয়ে দেয়া কর্তব্য।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা

এ জন্যে দীন-ইসলামে 'জামায়াত'কে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে এবং দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার দাওয়াত প্রচারের জন্যে এই কর্মনীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, প্রথমে একটি সুসংহত দল গঠন করতে হবে এবং তার পরেই আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে, আর এ কারণেই জামায়াতবিহীন যিন্দেগীকে জাহিলী যিন্দেগী এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারই শামিল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

الاَّ اَنْ يُّرَاجِع ومَنْ دَعَا بِدعْوى الْجَاهِلِيَّة فَهُو مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ ، قَالُوْا يَا رسُوْل الله وَاِنْ صَامَ وصَلَّى؟ قَالَ وَاِنْ صَامَ وصَلَّى وزَعم اَنَّهُ مُسْلِمٌ - (أحمد وحاكم)

"আল্লাহ আমাকে যে পাঁচটি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন আমিও তোমাদেরকে তারই হুকুম দিচ্ছি। তা হলো-জামায়াত,-নেতৃ-আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ। যে ব্যক্তি ইসলামী জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে যেন নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলেছে। অবশ্য যদি সে জামায়াতের দিকে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে, তবে স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে (অর্থাৎ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিকে) আহ্বান জানাবে, সে হবে জাহান্নামী। (এতদশ্রবণে) সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, নামায-রোযা আদায় করা সত্ত্বেও কি সে জাহান্নামী হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ (হাঁ) যদিও সে নামায-রোযা পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে (তাহলেও সে জাহান্নামী হবে)।" –আহমদ ও হাকেম।

এই হাদিস থেকে নিম্নোক্ত তিনটি কথা প্রমাণিত ঃ

একঃ দীনী কাজের সঠিক নিয়ম হচ্ছে এই যে, সর্বাগ্রে একটি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল জামায়াত গঠিত হবে এবং তার জন্যে এমন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে সবাই একজন নেতার আনুগত্য করে চলবে। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা হিজরত করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

দুইঃ জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা প্রায় ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারই নামান্তর। কারণ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ আরবের সেই জাহিলী যুগের দিকেই পুনঃ প্রত্যাবর্তন করছে, যে যুগে কেউ কারো প্রতি কর্ণপাত করতো না।

তিনঃ ইসলামের অধিকাংশ দাবী ও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জামায়াত এবং সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। এ জন্যেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায-রোযার পাবন্দী এবং মুসলিম হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও জামায়াত ত্যাগী ব্যক্তিকে ইসলামত্যাগী বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীও একথারই প্রতিধ্বনি করছে ঃ

لاَ اسْلاَمَ الاَّ بِجَمَاعَةٍ - (جامع بيان العلم لابن عبد البر)

"জামায়াত বিহীন ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই।"

কাজের তিনটি পথ

যারা জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলার পাবন্দী করতে পারবেন আমরা তাদেরকে বলে থাকি আপনাদের সামনে এখন মাত্র তিনটি পথই খোলা রয়েছে এবং তার যে কোন একটি পথ বাছাই করে নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে।

প্রথমতঃ আপনাদের মন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের দাওয়াত, আকীদা-বিশ্বাস, মূল লক্ষ্য, জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা, কর্মনীতি ইত্যাদি সব কিছুই খালিস ইসলাম সম্মত এবং কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতির যা কর্তব্য, আমরা ঠিক তা-ই সম্পাদন করছি, তাহলে আমাদের সাথে এই কাজে আপনারা শামিল হন।

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন কারণবশত আমাদের কাজে আপনারা সন্তুষ্ট হতে না পারেন এবং অন্য কোন দলকে ইসলামী উদ্দেশ্যে খাঁটি ইসলামী পন্থায় কাজ করতে দেখেন, তাহলে তাতেই শামিল হয়ে যান। কেন না, মাত্র দেড়খানা ইট দ্বারা মসজিদ নির্মানের শখ আমাদের নেই।

তৃতীয়তঃ যদি আমাদের বা অন্য কোন দলের উপর আপনাদের আস্থা না থাকে, তাহলে ইসলামী দায়িত্ব পালন করা তথা দীন-ইসলামকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তার

> সত্যতার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে আপনারা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে খাঁটি ইসলামী পন্থায় একটি সুসংহত জামায়াত গঠন করুন।

এই তিনটি পথের যে কোন একটি বাছাই করে নিলে ইন্‌শাআল্লাহ আপনারা মধ্যপন্থী বলেই গণ্য হবেন। কেবল আমাদের জামায়াতই সত্যপন্থী এবং আমাদের জামায়াতের বহির্ভূত লোকেরা সবাই বাতিলপন্থী এরূপ দাবী আমরা কোন্ দিন করিনি আর সুস্থমস্তিষ্ক থাকা পর্যন্ত কোন দিনই তা করবো না। আমরা লোকদের কখনও আমাদের জামায়াতের দিকে আহ্বান জানাইনি। বরং মুসলমান হিসেবে যে দায়িত্বটি আমাদের ও আপনাদের সবার উপরে সমানভাবে ন্যস্ত রয়েছে, আমাদের দাওয়াত হচ্ছে তার প্রতি। আপনারা যদি সে দায়িত্ব পালন করেন, তা আমাদের সাথে মিলেই করুন বা অন্য কোন পন্থায়-আপনাদের কাজ সত্যপন্থীর কাজই হবে। কিন্তু আপনারা নিজেরাও এ কাজে অগ্রসর হবেন না এবং অন্য কারো সহযোগিতাও করবেন না, অথচ শুধু টালবাহানা করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়ার সামনে তার সত্যতার সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন কিংবা আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় করতে থাকবেন আর আপনাদের কথা ও কাজ ইসলামের বিপরীত বস্তুর সাক্ষ্য বহন করবে, এটা কোন প্রকারেই সংগত হতে পারে না। ব্যাপার যদি দুনিয়ার মানুষের সাথে হতো, তাহলে না হয় টালবাহানা করে কোন প্রকার কাজ হাসিল করা যেতো। কিন্তু এ স্থানে তো ব্যাপার হচ্ছে এমন এক মহান প্রভুর সাথে, যিনি অন্তরের অন্তঃস্থলের খবরও রাখেন। কাজেই কোন চালবাজি দ্বারা তাঁকে প্রতারিত করা সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন দীনী সংগঠন

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, একই উদ্দেশ্য এবং একই কাজ করার জন্যে বিভিন্ন দল গঠিত হওয়ার ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে ভুল মনে হতে পারে এবং এতে বিচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে এবং এখন শুধু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার প্রশ্ন নয় বরং নতুন করে প্রতিষ্ঠার

প্রশ্নই দেখা দিয়েছে, তাই এমনি পরিস্থিতিতে গোটা উম্মতের জন্যে 'আল-জামায়াত' (একটি মাত্র দল) গঠন করা সম্ভব নয়, যাতে শামিল হওয়া সবার পক্ষে শুধু অপরিহার্য নয়, বরং যা থেকে আলাদা থাকা বা বিচ্ছিন্ন হওয়াকে জাহিলিয়াত কিংবা ইসলাম ত্যাগের সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলের কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। এই দলগুলো যদি আত্ম-পূজা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থাকে এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামী উদ্দেশ্যে ইসলামী পন্থায়ই কাজ করে যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত এগুলো একত্রীভূত হয়ে যাবেই। কারণ সত্য পথের পথিকরা বেশীক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না, সত্যই তাদের একসূত্রে আবদ্ধ করে ফেলে। কেননা, সত্যের প্রকৃতিই হচ্ছে ঐক্য, সংহতি ও একাত্মবোধের প্রেরণা দান করা। অনৈক্য ও বিভেদ কেবল তখনি দেখা দিতে পারে, যখন সত্যের সংগে কিছুটা অসত্যের সংমিশ্রণ ঘটে, অথবা উপরে সত্যের প্রদর্শনী থাকলেও ভিতরে অসত্যই কাজ করতে থাকে।

আমাদের দাবী

এবার যারা আমাদের জামায়াতে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে শামিল হন, তাদের কাছে আমাদের দাবী কি ও এবং আমাদের কাছেই বা তাদের জন্যে কাজের কি প্রোগ্রাম রয়েছে তা আমি সংক্ষেপে পেশ করবো। প্রকৃতপক্ষে এক মুসলমানের কাছে ইসলাম যা দাবী করে, জামায়াতের রুকন বা সদস্যদের কাছে আমাদের দাবী তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমরা ইসলামের মূল দাবীর ব্যাপারে না অণু পরিমাণ কিছু বাড়াতে চাই আর না তা থেকে কিছু মাত্র কমাতে চাই। আমরা কোনরূপ কাট-ছাট না করে প্রতিটি মানুষের সামনে পূর্ণ ইসলামকেই পেশ করে থাকি এবং তাদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানাই যে, এই দীন ইসলামকে বুঝে শুনে সচেতনভাবে গ্রহণ করুন। এর দাবীগুলো ভেবে-চিন্তে ঠিকমত আদায় করুন এবং নিজেদের চিন্তা, কল্পনা, কথা ও কাজ থেকে এর নির্দেশ ও ভাবধারা বিরোধী যাবতীয় বস্তুকে বের করে দিন ও নিজেদের সমগ্র জীবন দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দান করুন। এই হচ্ছে আমাদের জামায়াতে ভর্তি হওয়ার ফিস এবং সদস্য

হওয়ার পদ্ধতি। আমাদের গঠনতন্ত্র, জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং আমাদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য সব কিছুই স্পষ্ট। এসব যাচাই করে যে কেউ দেখতে পারেন যে, আমরা প্রকৃত ইসলামে– কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামে আদৌ কোন কাটছাঁট বা হ্রাসবৃদ্ধি করিনি। বরং আমাদের কোন কথা যদি কুরআন-সুন্নাহ হতে অতিরিক্ত কিছু বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেন, তবে তা বর্জন করতে এবং কুরআন ও সুন্নাহয় বর্তমান রয়েছে অথচ আমাদের এখানে তা নেই, এমন কোন বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে আমরা তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে নিতে সদা প্রস্তুত। আমরা তো কোনরূপ কাটছাঁট না করে পূর্ণ ইসলামকে কায়েম করা এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্যেই সংঘবদ্ধ হয়েছি। এ ব্যাপারে যদি আমরা মুনাফিক বলে প্রমাণিত হই, তবে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে?

এভাবে যারা আমাদের জামায়াতে শামিল হন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দান করা এবং গোটা মানব জাতির সামনে এই সাক্ষ্য আদায় করার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। মৌখিক সাক্ষ্যদান সম্পর্কে আমরা আমাদের সদস্যদেরকে এমনিভাবে ট্রেনিং দান করছি যেন তারা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে অধিকতর যুক্তিপূর্ণভাবে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে, পরন্তু আমরা সংঘবদ্ধভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা ও তার তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রচার প্রোপাগাণ্ডার সকল সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমেরও চেষ্টা করছি। আর বাস্তব সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে এই যে, প্রথমত, এক একটি ব্যক্তি ইসলামের জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হবে, অতঃপর তাদের সমন্বয়ে সত্যিকার ইসলামী ভাবধারায় কার্যকরীরূপে লক্ষ্য করার উপযোগী একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠবে। অবশেষে এই সমাজটিই আপন চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বাতিল জীবন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করে সত্য জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবে; যা দুনিয়ার সামনে পূর্ণাংগ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করবে।

অভিযোগ এবং তার জবাব

ভদ্র মহোদয়গণ! এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি। এমন কাজ সম্পর্কে যে কোন মুসলমান আপত্তি তুলতে পারে তা আমরা কখনো ধরণাও করিনি। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা এ পথে পা বাড়িয়েছি, সেদিন থেকেই প্রশ্ন ও আপত্তির এক অপ্রতিরোধ্য সয়লাব আসছে। অবশ্য সব আপত্তিই ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় আর একই বৈঠকে সব কথার জবাব দান করা সম্ভবও নয়। তবে যেসব আপত্তিকে আপনাদের এই শহরে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার করা হচ্ছে, এখানে আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

নতুন ফিরকা

বলা হয় যে, আমাদের জামায়াত মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন ফিরকার গোড়া পত্তন করেছে। এ ধরনের কথা যারা প্রচার করে থাকেন, সম্ভবত ফিরকা সৃষ্টির মূল কারণগুলোই তাদের জানা নেই। মুসলমানদের মধ্যে যেসব কারণে ফিরকা বা উপদলের সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ দীনের সাথে সম্পর্কহীন কোন বস্তুকে আসল দীনের মধ্যে শামিল করে নিয়ে তাকেই কুফর ও ঈমান অথবা হিদায়াত ও গোমরাহীর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়তঃ দীনের কোন বিশেষ মাসয়ালাকে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকেই উপদল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা।

তৃতীয়তঃ ইজতিহাদী বিষয়াদিতে বাড়াবাড়ি করা এবং ভিন্ন মত পোষণকারীদের উপর ফাসিক ও কুফরীর অপবাদ চাপিয়ে দেয়া কিংবা অন্তত তাদের সাথে স্বতন্ত্র আচার পদ্ধতি অবলম্বন করা।

চতুর্থতঃ নবী করীম (স.)-এর পর কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করা এবং তার সম্পর্কে এমন কোন মর্যাদা দাবী

করা যা মানা বা না মানার উপর লোকদের ঈমান কিংবা কুফর নির্ভরশীল হতে পারে অথবা কোন বিশেষ দলে যোগদান করলেই সত্যপন্থী হওয়া যাবে এবং তার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানরা হবে বাতিলপন্থী এমন কোন দাবী উত্থাপন করা।

এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, উপরোক্ত চারটি ভুলের কোন্‌টি আমরা করেছি? কোন ভদ্রলোক যদি দলিল-প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে বলে দিতে পারেন যে, আমরা অমুক ভুলটি করেছি তবে তৎক্ষণাৎ আমরা তওবা করবো এবং নিজেদের সংশোধন করে নিতে আমরা মোটেই দ্বিধাবোধ করবো না। কেননা-আমরা আল্লাহর দীন কায়েম করার উদ্দেশ্যেই সংঘবদ্ধ হয়েছি, দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপ দ্বারা যদি উক্তরূপ ভুল প্রমাণিত না হয়, তবে আমাদের সম্পর্কে ফিরকা সৃষ্টির আশংকা কিভাবে করা যেতে পারে?

আমরা শুধু আসল ইসলাম এবং কোন কাটছাঁট না করে পূর্ণ ইসলামকে নিয়েই দাঁড়িয়েছি, আর মুসলমানদের কাছে আমাদের আবেদন শুধু এই যে, আসুন আমরা সবাই মিলে একে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়ার সামনে এর সত্যতার সাক্ষ্য দান করি।

বস্তুত দীনের কোন একটি বা কয়েকটি বিষয়কে নয় বরং পরিপূর্ণ দীন ইসলামকে আমরা সংগঠন ও সম্মিলনের বুনিয়াদ হিসেবে স্থির করে নিয়েছি।

ইজতিহাদী বিষয়ে আমাদের অভিমত

ইজতিহাদী বিষয়াদির ব্যাপারে যেসব মাযহাব ও মতবাদকে শরীয়তের নীতির ভেতরে থেকে মেনে নেয়ার অবকাশ রয়েছে, তার সবগুলোকেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করি। আমরা প্রচলিত মাযহাব ও মতামতগুলোর মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে সবার অধিকার স্বীকার করি এবং বিশেষ কোন ইজতিহাদী মতের ভিত্তিতে ফিরকার সৃষ্টি করাকে অসংগত বলে মনে করি।

গোঁড়ামি পরিহার

আমরা নিজেদের জামায়াত সম্পর্কেও কোনরূপ গোঁড়ামি করিনি অথবা কখনো এমন কথা বলিনি যে, সত্য কেবল আমাদের জামায়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা পুরোপুরি দায়িত্ব সচেতন হয়েই এ কাজের জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি এবং আপনাদেরকেও আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এখন আপনারা আমাদের সাথে উঠে দাঁড়াবেন, কি নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করবেন কিংবা অন্য কোন দায়িত্ব পালনকারীর সাথে মিলে কাজ করবেন, তা আপনাদেরই বিবেচ্য।

আমীরের মর্যাদা সম্পর্কেও আমরা কোনরূপ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হইনি। আমাদের আন্দোলন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি, এখানে কারো জন্যে বিশেষ কোন মর্যাদার দাবী করা হয়নি, কারো কিরামাত, ইলহাম ও পবিত্রতার কাহিনী সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির ছড়াছড়িও করা হয়নি, কারো ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের উপর জামায়াতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়নি, অথবা কারো ব্যক্তিত্বের প্রতি জনসাধারণকে আহ্বান জানানও হয়নি, বরং উদ্ভট দাবী-দাওয়া, স্বপ্ন, কাশফ, কিরামাত ও ব্যক্তি বিশেষের পবিত্রতার কাহিনী প্রচার থেকে আমাদের আন্দোলন সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র।

আদর্শবাদী আন্দোলন

এখানে কোন ব্যক্তিবর্গের দিকে আহ্বান জানান হয় না, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের যা জীবন লক্ষ্য, যে মূলনীতিসমূহের সমষ্টিকে বলা হয় ইসলাম, আমাদের আহ্বান হচ্ছে তারই প্রতি। যারা এই উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়, তারাই নির্বিশেষে আমাদের জামায়াতের সদস্য হয়ে থাকে।

আমীর নির্বাচন

অতঃপর এই সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করেন। আমীরের পদে কারো ব্যক্তিগত প্রাপ্য অধিকার স্বীকৃত নয়, বরং

সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হলে জামায়াতে একজন প্রধান থাকা দরকার বলেই একজনকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচিত আমীরকে পদচ্যুত করে তদস্থলে জামায়াতের অন্য কাউকে আমীর নির্বাচিত করা যেতে পারে। পরন্তু কেবল আমাদের এই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদেরই তাঁর আনুগত্য করতে হয়। যারা তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করবে, তারা জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে, এরূপ কোন ধারণা আমরা কোন দিনই পোষণ করিনি।

এবার আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এমনি পদ্ধতিতে কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলনের ফলে মুসলিম জাতির মাঝে কেমন করে একটি নতুন ফিরকার সৃষ্টি হতে পারে? বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, যারা নিজেরাই ফিরকাবন্দী ও উপদলীয় কোন্দলে জড়িত, যারা হামেশা স্বপ্ন, কাশফ, কিরামাতের চর্চা করে থাকেন, যাদের সমস্ত কাজ-কর্ম কোন 'হযরত'-এর ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে, যারা ব্যক্তি বিশেষের জন্য কোন বিশেষ মর্যাদার দাবী করে থাকেন, খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক-মুনাযারায় লিপ্ত হন এবং ইজতিহাদী মতামতের ভিত্তিতে দলাদলি ও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, আমাদের সম্পর্কে অপবাদ রটাতে তাদেরকেই দেখা যায় সর্বাধিক তৎপর। তাই কারো বিরক্তির পরোয়া না করেই আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের সম্পর্কে এসব ভদ্রলোকগণ যেসব কথা প্রচার করেন, যে কারণে এরা আমাদের উপর বীতশ্রদ্ধ, আমাদের প্রকৃত মতাদর্শ তা নয় বরং দীন ইসলামের যে আসল কাজটি তাদের মনঃপূত নয়, আমরা সেই দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছি। আর এ কাজের জন্য যে কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি তা দ্বারা তাদের অনুসৃত কর্মনীতির ভ্রান্তিগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ কারণেই তারা আমাদের উপর বীতশ্রদ্ধ।

পৃথক দল গঠনের প্রয়োজন

আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে, এ কাজ করাই যখন তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল তখন করতে, কিন্তু পৃথক নাম নিয়ে একটি স্থায়ী জামায়াত গঠন করলে

কেন? এ দ্বারা মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুত এ হচ্ছে এক অভিনব প্রশ্ন। আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে, ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী রাজনীতি, অনৈসলামিক শিক্ষা, মাযহাবী কোন্দল সৃষ্টি অথবা নিরেট দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কিংবা ফ্যাসিস্ট পন্থায় যদি মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র নামের বিভিন্ন সমিতি ও দল-উপদল গড়ে ওঠে, তবে সেগুলোকে দ্বিধাহীন চিত্তেই বরদাশত করা হয়। কিন্তু দীন ইসলামের আসল কাজের উদ্দেশ্যে যদি খালিস ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কোন জামায়াত গড়ে ওঠে, তবে হঠাৎ মুসলিম জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় এবং একটি মাত্র জামায়াতই তাদের কাছে অসহ্য হয়ে পড়ে। এ থেকে এ কথাই মনে হচ্ছে যে, প্রশ্নকর্তাগণ আসলে জামায়াত বা দল গঠনের বিরোধী নন, বরং দীনের আসল কাজের উদ্দেশ্যে দল গঠনেই তাদের যত আপত্তি। যাই হোক, তাদের কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, দল গঠনের অপরাধ আমরা সাগ্রহে নয় বরং একান্ত বাধ্য হয়েই করেছি।

সবাই জানেন যে, এই জামায়াত গঠন করার পূর্বে ক্রমাগত কয়েক বছর আমি একাকী মুসলমানদেরকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছি যে, "তোমরা এ কোন্ পথে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করছো? তোমাদের আসল কাজ হচ্ছে এই। এর প্রতি সমগ্র চেষ্টা-সাধনা কেন্দ্রীভূত করাই তোমাদের কর্তব্য"। তখন সমস্ত মুসলমান যদি এ আহ্বান গ্রহণ করতো, তবে কিছুই বলার ছিল না। তখন মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন জামায়াত গঠিত হওয়ার পরিবর্তে সকল মুসলমান মিলে একটি জামায়াতে পরিণত হতো। আর যে 'আল-জামায়াত' বা একমাত্র জামায়াতের বর্তমানে ভিন্ন জামায়াত গঠন করা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ অন্তত পাক-ভারতে তা গঠিত হতো।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের কোন বিশেষ দলও যদি আমাদের সে আহ্বান কবুল করে নিতো, তবুও আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাতে শামিল হতাম। কিন্তু আমরা ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও যখন কেউ তার প্রতি কর্ণপাত করলো না, তখন এ কাজকে যারা সত্য এবং অপরিহার্য কর্তব্য বলে

বিশ্বাস করতেন, তারা নিজেরাই সমবেত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হন। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, আমরা যদি এ-ও না করতাম, তাহলে আমাদের পক্ষে আর কি-ই বা করার ছিল? আপনারা যদি এ কাজকে ফরজ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন তো নিজেদের দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন। অথবা বলুন, আপনাদের সমিতি ও দল-উপদলগুলো কি বাস্তবিকই এ দায়িত্ব পালন করে চলছে? যদি তা না হয়, তবে বলবো যে, আপনাদের অবস্থা এমনি পর্যায়ে এসে গেছে যে, যারা সচেতনভাবে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছে আপনারা উল্টো তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।

আমীর বনাম নেতা

আমাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয় যে, তোমরা আপন জামায়াতের নেতার জন্যে 'আমীর' শব্দটি বেছে নিলে কেন? 'আমীর' বা 'ইমাম' তো কেবল স্বাধীন ক্ষমতাশালী ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তিই হতে পারেন। তারা এ কথার সমর্থনে কিছু হাদীস পেশ করে এই যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন যে, 'ইমামত' (নেতৃত্ব) শুধু ইলমের ইমামত, নামাযের ইমামত, কিংবা যুদ্ধ–বিগ্রহের ইমামই হতে পারে। এ ছাড়া তো আর কোন প্রকারের ইমামত নেই। এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন, তারা কেবল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ইমামতের প্রতিষ্ঠাকালীন ফিকাহ ও হাদীস সম্পর্কেই খোঁজ-খবর রাখেন। কিন্তু মুসলমানদের জামায়াত নেতৃত্বচ্যুত হলে, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলে এবং ইসলামের জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্পর্কে তারা মোটেই ওয়াকিফহাল নন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এরূপ পরিস্থিতিতে কি মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে এবং কোন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী 'ইমাম' পাঠানোর জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে? না তাদেরকে এমনি 'ইমাম' কায়েম করার জন্যে কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাও চালাতে হবে? তারা যদি স্বীকার করেন যে, এজন্যে সমবেত প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তবে তারা অনুগ্রহপূর্বক বলুন,

জামায়াত গঠন না করে কিভাবে সমবেত প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব? তারা যদি জামায়াত গঠনের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন তো বলুন কোন নেতা, কোন প্রধান, কোন আদেশদাতা ছাড়া কোন জামায়াত চলতে পারে কি? তারা যদি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তবে ইসলামী কাজের উদ্দেশ্যে যে ইসলামী জামায়াত গঠিত হবে, তার নেতার জন্য ইসলামের কি পরিভাষা নির্ধারিত রয়েছে তা তারাই আমাদের বলে দিন। যে কোন পরিভাষাই তারা বলুন না কেন, তা যদি ইসলামী হয় তবে তা-ই আমরা গ্রহণ করবো। আর যদি এ-ও তারা না পারেন তবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিন যে, ক্ষমতা লাভের পরবর্তী অবস্থার জন্যে তো ইসলামের অনেক পথ-নির্দেশ মওজুদ রয়েছে কিন্তু ক্ষমতাহীন অবস্থায় কি করে তা অর্জন করতে হবে, সে সম্পর্কে ইসলাম কোন পথ-নির্দেশ দেয়নি। এ কাজ যারা করবেন, তাদেরকে অনৈসলামিক পন্থায় এবং অনৈসলামিক পরিভাষা অনুযায়ী করতে হবে। তাদের অভিপ্রায় যদি এ না হয়ে থাকে, তবে সভাপতি, লীডার, নেতা, কায়েদ ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহারে যাদের আপত্তি নেই, তারা কেন 'আমীর'-এর পরিভাষা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেন, এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার।

সাধারণত এ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে লোকদের কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। এর কারণ এই যে, নবী করীম (সা.)-এর যুগে যখন 'আমীর' বা 'ইমাম'-এর পরিভাষা ব্যবহার করা হতো, তখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর যতদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই রাসূল হিসেবে দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। কাজেই 'আমীর বা 'ইমাম'-এর পরিভাষা ব্যবহারের কোন অবকাশই তখন ছিল না।

ইসলামের প্রকৃতি

কিন্তু ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টিপাত করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই দীন-ইসলাম মুসলমানদের প্রতিটি সম্মিলিত কাজের নিয়ম-শৃঙ্খলার দাবী করে। আর এই নিয়ম-শৃঙ্খলার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কাজ

জামায়াতবদ্ধ হয়ে করতে হবে এবং একজনকে হতে হবে তার 'আমীর'। অনুরূপভাবে নামায পড়তে হলে একজনকে 'ইমাম' নিযুক্ত করে জামায়াতের সাথে পড়তে হবে। হজ্জ করতে হলে সুশৃঙ্খল পন্থায় একজনকে আমীরে হজ্জ হতে হবে। এমন কি তিনজন লোক যদি সফরে বের হয়, তবে তাঁদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে সুশৃঙ্খল পন্থায়ই সফর করতে হবে।[১]

اذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ -

ইসলামী শরীয়তের এ মূল ভাবধারটিই হযরত উমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ঃ

لاَ اِسْلاَمَ الاَّ بِجمَاعَةِ وَلاَ جمَاعَةَ الاَّ بِامَارَةٍ وَلاَ امَارَةَ الاَّ بِطَاعَةٍ - (جامع بيان العلم لابن عبد البر)

"জামায়াতবিহীন ইসলাম, ইমারতবিহীন জামায়াত ও আনুগত্যবিহীন ইমারত বলতে কোন জিনিস নেই।"

এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা সত্যের সাক্ষ্যদানের চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্যে যে জামায়াত গঠন করা হবে, তার নেতার জন্যে 'আমীর' বা 'ইমাম' শব্দের ব্যবহার সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইমাম শব্দের সাথে যেহেতু বিশেষ অর্থ জড়িত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমরা নানা ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে এ শব্দটি বাদ দিয়ে 'আমীর' শব্দটি গ্রহণ করেছি।

---

১. মসনাদে আহমদ-এ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْا بِفَلاَةٍ مِّنَ الاَرْضِ الاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحدهُمْ -

অর্থঃ "তিনজন লোক জংগলে থাকলেও নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত না করা জায়িয নয়।"

এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুধু সফরকালেই নয়, বরং সর্বাবস্থায়ই মুসলমানদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করতে হবে এবং তাদের কোন সামগ্রিক কাজই 'জামায়াত' ও 'ইমারত' ছাড়া সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়।

যাকাত আদায়ের অধিকার

এখানে এসে আমি আর একটি অভিনব প্রশ্ন শুনতে পেলাম তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের জামায়াতের নেতা নির্বাচিত হবেন, যাকাত আদায় করার কোন অধিকার তার নেই। কেননা, যাকাত শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরই আদায় করতে পারেন। প্রশ্নকর্তাগণ সম্ভবত আমাদের যাকাত আদায়ের পন্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সাধারণ মুসলমানদের কাছে কখনও জামায়াতের বায়তুল-মালে যাকাত জমা দেয়ার দাবী জানাইনি। অথবা কখনও এমন কোন কথাও বলিনি যে, যারা আমাদের তহবিলে যাকাত জমা দেবেন না তাদের যাকাতই আদায় হবে না। আমরা শুধু জামায়াতের রুকনদের কাছেই নিজেদের বায়তুল-মালে যাকাত দেয়ার দাবী জানিয়ে থাকি। এ দ্বারা মুসলমানদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি অনুসারে সম্মিলিতভাবে যাকাত দেয়া ও ব্যয় করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, আমাদের এ কাজের ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কি দোষটা হলো? জনসাধারণকে যদি ঘরে বসে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে বলার অধিকার থাকে, তাহলে যাকাত ব্যক্তিগতভাবে আদায় না করে সম্মিলিতভাবে আদায় করতে বলার অধিকার কেন থাকবে না? লোকদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ কিংবা ভর্তি ও সদস্য পদের ফি গ্রহণ জায়িয কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (স.) কর্তৃক নির্ধারিত ফরয আদায় করার আহ্বান জানানো নাজায়িয, এটা কেমন আজব কথা।

বায়তুলমাল

এখানে এর চেয়েও অভিনব একটি প্রশ্ন শোনা গেল। তা হলো এই যে, তোমরা 'বায়তুলমাল' কেন বানিয়েছ। বস্তুত এ ধরনের প্রশ্নাবলী শুনে মনে হয় যে, ইসলামী পরিভাষাগুলোর সংগেই যেন প্রশ্নকর্তাদের কিছুটা শত্রুতা রয়ে গেছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, সম্মিলিত কাজে অর্থ ব্যয় করার সুবিধার্থে

প্রত্যেক দল বা সংগঠনেরই একটি অর্থ তহবিল থাকে। আমরা তাকে বায়তুল মাল বলে থকি। কেননা, এটাই হচ্ছে একমাত্র ইসলামী পরিভাষা। আমরা যদি এর নাম অর্থ ভাণ্ডার রাখতাম, তাহলে তাদের কোন আপত্তি থাকত না। অথবা যদি ট্রেজারী বলতাম, তাহলেও হয়ত তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আমরা একটি ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করার কারণেই তারা এটাকে বরদাশত করতে পারছেন না।

প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ প্রশ্নই এমনি নিরর্থক যে, এগুলোর জবাব দান করে শ্রোতাবৃন্দের সময় নষ্ট করার মোটেই আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তবু আমি নমুনা স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দান করলাম এ জন্যে যে, যারা নিজেরাও দায়িত্ব পালন করতে চান না, বরং অন্যকেও তা করতে দিতে প্রস্তুত নন, তারা কি ধরনের বাহানা, কুটিল প্রশ্ন এবং সন্দেহজনক বিষয় খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং নিজেরা যেমন আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকেন, তেমনি করে অন্যকেও কিভাবে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

বস্তুত অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ এবং বিতর্ক-মুনাযারায় লিপ্ত হওয়া আমাদের কাজের পন্থা নয়। যদি কেউ সহজ-সরলভাবে আমাদের কথা বুঝতে চান, তো তাঁকে বুঝানোর জন্যে আমরা সদা প্রস্তুত। আর যদি কেউ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিতে চান তা-ও আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করলে এবং আমাদেরও তাতে জড়িত করতে চাইলে আমরা তার সম্মুখীন হতে মোটেই সম্মত নই। বিরুদ্ধবাদিগণ যতক্ষণ ইচ্ছা এ খেল চালু রাখতে পারেন।

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়

১. পরিচিতি–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
৬. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

৭. গঠনতন্ত্র–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৮. মেনিফেস্টো–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৯. সংগঠন পদ্ধতি– বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
১০. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১১. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১২. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

১৩. সত্যের সাক্ষ্য
১৪. ইকামাতে দ্বীন
১৫. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৬. হেদায়াত
১৭. ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী
১৮. ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের সহীহ্ জযবা
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
২০. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২১. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২২. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

২৩. কার্যবিবরণী–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (১ম ও ২য় খণ্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদীর একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯